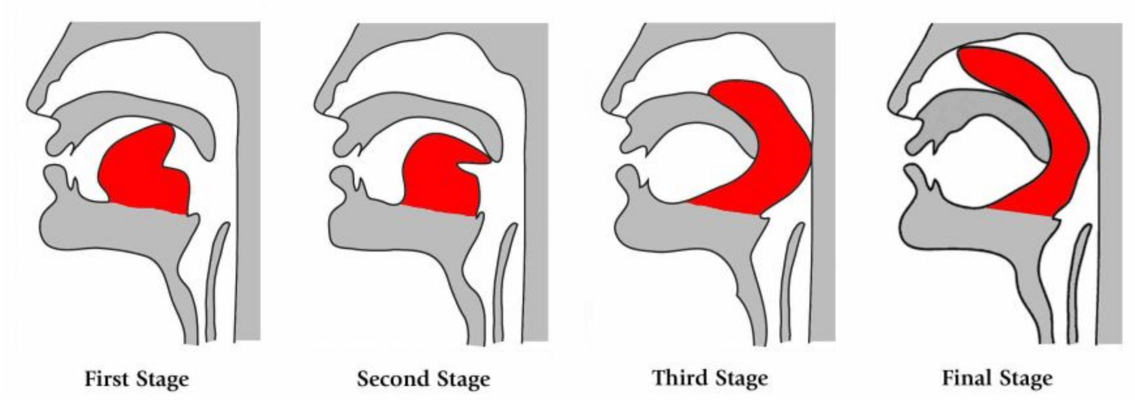

খেচরিমুদ্রা

খেচরীমুদ্রা

গোমাংসং ভক্ষয়েতনিত্যং পিবেদমরবারুনীম।
কুলীনং তমহং মন্যে ইতরে কুলঘতকা:।।
গোশব্দেনোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।
গোমাংস ভক্ষনং তত্তু মহাপাতকনাশানম।।
জিহ্বাপ্রবেশসভূতবহ্নিনোৎপাদিত: খলু।
চন্দ্রাৎ স্রবতি য: সার: স স্যাদমরবারুণী।।
মদ্যদানে মহাপুন্যং সর্বতন্ত্রে শ্রুতং ময়া।

গুরুমুখী ব্রহ্মবিদ্যার প্রথমবিদ্যা হলো খেচরীমুদ্রা । “খেচরী”র অর্থ হল ‘খ’ তে বিচরণ করা I ‘খ’ এর অর্থ ”আকাশ” I ”আকাশ” শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ‘কাশৃ’ ধাতু থেকে I ‘কাশৃ’ ধাতু দীপ্তো I কাজেই ”আকাশ” অর্থাৎ দীপ্তিমস্ত “ব্রহ্মতত্ত্ব”এ তা সম্ভব হয় I
ভগবান দত্তাত্রেয় বলেছেন “কপাল বিবরে অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যবৃত্ত ও বন্ধ করে ভ্রুমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করবে” এরই নাম “খেচরী” I
“প্রভুর জন্য যদি প্রাণে আর্তি থাকে শরণাগতির ভাব নিয়ে বুক ভরা কান্না নিয়ে ধ্যান করতে থাকলে” “নিবিড় ধ্যান”এ “প্রভুর দর্শন” মেলে I প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় “জিহ্বা” স্বতঃই বিপরীতগামী হয়ে যায় I “ধ্যান” ভাঙলে “সাধক” অনুভব করতে পারেন “দিব্যানুভূতি”র কালে বিনা চেষ্টায় বিনা কসরতেই “জিহ্বা” “তালুকুহর”এ প্রবিষ্ট ছিল I
“শুদ্ধশিবের মহাদেবে”কে “শুণ্ডিকেশ্বর” নামেও অভিহিত করা হয় I “শুণ্ডিক” শব্দের অর্থ “আলজিভ/আলজিহ্বা” I “শুণ্ডিক” শব্দের দ্বারা একটি গুহ্য যোগক্রিয়া “খেচরী মুদ্রা”র ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে I “খেচরী মুদ্রা”র আন্তর ক্রিয়ায় “জিহ্বা”কে “আলজিহ্বা”র উর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবিষ্ট করিয়ে “সহস্রার” মন্ডলে গিয়ে “জিহ্বা”কে দিয়ে ঠোক্কর মারতে হয় I
“যোগী ব্যক্তি” “রসনা”কে বিপরীতগামিনী করে লম্বিকা অর্থাৎ “আলজিহ্বা”র উর্ধ্বস্থিত গর্তে “তালুকুহর”এ প্রবেশ করিয়ে “জিহ্বা”কে স্থিরতর রেখে ধ্যান করতে

থাকবেন ।
"খেচরী মুদ্রা সাধনা"র দ্বারা "জিহ্বা"কে বিপরীতগামী করতঃ তালুমধ্যে প্রবেশ করিয়ে "কপালকুহর"এ উর্ধ্বগত করে রাখতে হয় । এই গুহ্য "যোগক্রিয়া"র অনুষ্ঠান যখন ভালভাবে আয়ত্ব হয়ে যায় তখন অন্যান্য সাধারণ ক্রিয়া এবং পুজানুষ্ঠান ত্যাগ করে "জিহ্বা"কে "কপালকুহর"এ স্থির রাখতে হয় । তাতেই "সাধক"এর "শিব দর্শন" ঘটে অর্থাৎ "সাধক" নিজেই শিবস্বরূপ হয়ে যান ।
বিশেষতঃ "সমাধি" লাভ করতে হলে "খেচরী মুদ্রা" [জিহ্বা কন্ঠকূপের মধ্যে আলজিহ্বার উপর] আয়ত্ত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন ।
এই "মুদ্রায় সিদ্ধি" হতে হলে "ছেদন-দোহন- মর্দন"ক্রিয়া অপরিহার্য ।
"যোগশাস্ত্র"এ ইহা বর্ণিত আছে যাহা হল "জিহ্বার নিম্নভাগের সঙ্গে মুখগহ্বরের মধ্যে নীচের দিকে যে শিরা সংলগ্ন আছে, তা ছেদন করে জিহ্বার অগ্রভাগ"এ চালনা করতে হবে ।"জিহ্বা"কে প্রতিদিন ননী মাখন দিয়ে "দোহন" করে লৌহযন্ত্র [লৌহ নির্মিত এক প্রকার সুক্ষ্মযন্ত্র অভাবে জীবছোলা দ্বারা] দ্বারা "কর্ষণ" করতে হয় । কিছুদিন এইভাবে করতে করতেই "জিহ্বা" ক্রমশঃ "দীর্ঘতর" হয়ে যাবে । যখন দেখা যাবে যে "জিহ্বা" "ভ্রুমধ্যস্থ স্থান স্পর্শ" করতে পারছে তখন ঐ "জিহ্বা"কে "তালুর মধ্যপথ"এ "উর্ধ্বদিকে কপালকুহরে" প্রবেশ করিয়ে "ভ্রুমধ্যে দৃষ্টি" স্থির করতে হয় । এর নাম "খেচরী মুদ্রা" । "খেচরী মুদ্রা"য় ভালভাবে "অভ্যস্ত" হলে তবেই "সাধক"এর "নাদযোগ সমাধি অভ্যাসের অধিকার" জন্মে।
"যোগী" ব্যক্তি "জিহ্বা"কে বিপরীতগামী করে লম্বিকার অর্থাৎ "আলজিহ্বার উর্ধ্বর্স্থিত গর্ত তালুকুহর"এ ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ স্থানে "জিহ্বা"কে স্থির কর "ধ্যান" করতে থাকবেন তাতে সকল রকম "কর্মবন্ধনের ভয়" দূর হয় । ঐ "ধ্যান পরিপক্ক" হলে "প্রগাঢ় ধ্যান"এর অবস্থায় "সহস্র চক্রক্ষরিত সুধা বা মধুক্ষরণ" হতে থাকে সেই "মধু পান" করলে "শরীর রোগহীন হয়-অতীন্দ্রিয় জগতের অনেক আলৌকিক দৃশ্যের দর্শন" ঘটে ।
"খেচরী মুদ্রা[র কৌশল" শিখতে হয় । এই "দুটি স্তর অতিক্রম" করলে দত্তাত্রেও কথিত "তৃতীয় ক্রিয়া"র ""ধ্যান কৌশল শিক্ষা" নিতে হয় ।
সেই "ধ্যান কৌশল" হচ্ছে, "সাধক" যদি "শিবনেত্র হয়ে অর্থাৎ দুটো চোখের তারাকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত দিব্য জ্যোতির্ময় অন্তরাত্মার ভাবনা করেন" তাহলে "বিদ্যুত প্রভা সদৃশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ" প্রত্যক্ষ হয় । "ব্রহ্মজ্যোতিঃপ্রত্যক্ষ" হলে "সাধনা"র আর কি বাকি থাকে ।
সুপ্রসিদ্ধ "যোগীরাজ শ্যামা চরণ লাহিড়ী" যেভাবে "খেচরী মুদ্রার কৌশল" শিখিয়ে গেছেন সেই "ক্রিয়া"কে তিনি সহজতর নিরাপদ পদ্ধতি বলে ভাবতেন । তিনি "ছেদন-দোহন"আদির বিষম বিপক্ষে ছিলেন । তিনি যে "পদ্ধতি"র উপদেশ দিতেন তার নাম "তালব্য মুদ্রা" ।
"ঋগ্বেদে"এর একটি "বিশেষ মন্ত্র" আছে । "পস্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টিয়ে তালুতে ঠেকিয়ে সেই সিদ্ধ বেদমন্ত্র ছন্দানুসারে উচ্চারণ করতে থাকলে সেই মন্ত্রের এমনি বর্ণবিন্যাস যে তা উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেই প্রতি বর্ণের উদ্ ঘাত ও স্পন্দন অভ্যাস কালের মধ্যেই জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য করে" ।
"যোগশাস্ত্র"এ এসব বর্ণনা থাকলেও "শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেব"এর ক্ষেত্রের "বৈশিষ্ট্য" এই যে এখানে "খেচরী মুদ্রা" আয়ত্ব করার জন্য বেচারা "জিহ্বা"কে টেনে হিঁচড়ে কোন "ছেদন-দোহন-কর্ষণ-মার্জন"আদির বিড়ম্বনা বা অত্যাচার সহ্য করতে হয় না । "শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেব"এর কৃপায় "জিহ্বা"কে কেবল সাধ্যমত "বিপরীতগামী" করে

"জপ" করতে করতেই "খেচরী মুদ্রা"য় "সিদ্ধিলাভ" ঘটে I
"প্রভুর জন্য যদি প্রাণে আর্তি থাকে শরণাগতির ভাব নিয়ে বুক ভরা কান্না নিয়ে ধ্যান করতে থাকলে" "নিবিড় ধ্যান"এ "প্রভুর দর্শন" মেলে I প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় "জিহ্বা" স্বতঃই বিপরীতগামী হয়ে যায় I "ধ্যান" ভাঙলে "সাধক" অনুভব করতে পারেন "দিব্যানুভুতি"র কালে বিনা চেষ্টায় বিনা কসরতেই "জিহ্বা" "তালুকুহর"এ প্রবিষ্ট ছিল I
এখানে "ব্রহ্মজ্যোতিঃ" বিষয়ক কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যাহা হল
"শিবনেত্র" হয়ে চোখের তারা দুটোকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার জ্যোতির্ময় রূপ কল্পনা করতে করতে যে "জ্যোতি"র প্রকাশ ঘটে থাকে সে "জ্যোতির আভাস হতে পারে-সর্বাংশে তাকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলা যাবে না" I
"কান্না" অর্থ কেদে আনা I "নিষ্কাম"ভাবে "ঈশ্বর"এর জন্য কাদলে "ঈশ্বর"কে পাওয়া যায় I
"সাধকের আকুতি এবং আশুতোষের কৃপা"এই হল "ব্রহ্মদর্শন"এর মূল কথা I
যে "জ্যোতি বিনা কল্পনায় উৎপন্ন হয়-যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয়- যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায়"সেই "জ্যোতি""পরমাত্মা"য় অবস্থিতি বলে জানবে I সেই "দিব্যজ্যোতি"ই যথার্থতঃ "ব্রহ্মজ্যোতিঃ"I

যার সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরের অমৃতগ্রন্থি (পাইনিয়াল গ্রন্থি) যা বহু সাধকের কাছেই রহস্যময় এবং অমৃতকর তাহা জাগ্রত করা হয় । গুরুমুখী ব্রহ্ম-বিদ্যায় ব্যখ্যা আছে যে কিভাবে বেদান্তের খেচরীমুদ্রা যৌগিক প্রক্রিয়াকে প্রস্তুত করা হয়েছে এই অমৃতগ্রন্থিকে (পাইনিয়াল গ্রন্থিকে) সক্রিয় করার জন্য - যা অত্যন্ত ভাবে গুরুমুখী । এই অমৃতগ্রন্থি (পাইনিয়াল গ্রন্থি) জাগ্রত হলে একজন মানুষের মধ্যে এমন এক পরমদিব্যজ্ঞান -পরমদিব্যআনন্দ বা পরমদিব্যসুখ সৃষ্টি করতে পারে যা আপনার আজীবনের সমস্থ অর্জিত জড়োজগতের জ্ঞান এবং জড়োজগতের সুখের বাইরে।গোভক্ষণের আধ্যাত্মিক নাম খেচরিমুদ্রা। এই যোগশাস্ত্রে বলা রয়েছে গো অর্থাৎ বেদে জিহ্বাকে বোঝাই, আর এই জিহ্বাকে গুরুমুখী বিদ্যা সাহায্যে তালুকুহরে প্রবেশ করানোই গো মাংস ভক্ষণ- তন্ত্র শাস্ত্রে ইহাকেই মাংস সাধনা বলেছে। এই প্রকারে যিনি গো মাংস ভক্ষণ করেন অর্থাৎ জিহ্বাকে নিশ্চল অবস্থার তালুকুহরে রেখে কূটস্থে ধ্যানরত থাকেন সেই সাধকই অমৃত পান করেন। কারণ সহস্রার থেকে ক্ষরিত যে অমৃতসুধা তা তিনি পান করতে সমর্থ হন। জিহ্বা উপরে উঠিয়ে তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে জিহ্বাকে নিশ্চল ভাবে রাখলে গলমধ্যে যে মিষ্টরস অনুভূত হয় তাকেই অমৃত বলে।খেচরী অমৃতগ্রন্থি অথবা পিনাইল গ্ল্যান্ড (Pineal gland) এবং মূলহরমোন গ্রন্থি অথবা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড (Pituitary gland) এর বিভিন্নতা জানা সকলের উচিত। আজ্ঞাচক্রে দুই ভুরুর মাঝখানে দেড় ইঞ্চি ভেতরে পিনিয়াল গ্যান্ড অবস্থিত– এটি অর্ধ সেঃ মিঃ লম্বায় & 20-25 গ্রাম ওজন। আমরা যখন খেচরীমুদ্রা করি, তখন পিনিয়াল গ্রান্ড উত্তেজিত হয়ে একটি
ক্ষরণের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে মেলোটনিন। এই মেলোটনিন ক্ষরণের ফলে শরীরের কোষগুলি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রতিদিন আমরা 21600 বার নিঃশ্বাস- প্রশ্বাস নিই, তার ফলে শরীরের কোষগুলি যে ধ্বংস হয় তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পিনিয়াল গ্যান্ডকে নিয়মিত উত্তেজিত রাখার অভ্যাস থাকা ভাল।এই পিনিয়াল গ্যান্ডের আয়ু বড় কম- চল্লিশ বছর বয়সে শুকিয়ে যায়। তখন থেকে ধীরে ধীরে মানুষের জীবনে অকাল বার্ধক্য নেমে আসে। তাই অল্প বয়স থেকেই

খেচরীমুদ্রা দ্বারা ঐ পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে সক্রিয় রাখলে এর আয়ু বেড়ে যায় এবং বার্ধক্য তখন বহুদূরে থাকে। পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আলো এবং অন্ধকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সূর্য উঠলে মেলাটোনিনের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। খেচরীমুদ্রা করার ফলে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড যে ক্ষরণ হয়, তাতে স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায় & শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে এবং রক্তের উর্দ্ধচাপ হয় না।
ধ্যানের উচ্চতর অবস্থায় একজন যোগী যখন ইন্দ্রিয়ের থেকে তার জীবনী শক্তিকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং তার মনকে আত্মার সাথে একত্রিত করে, তখন সে তার শারীরিক দেহে পরমানন্দের রোমাঞ্চ হিসাবে একটি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। উন্নত যোগীরা জানেন কীভাবে খেচরী মুদ্রা নামক একটি নির্দিষ্ট কৌশলের মাধ্যমে যা শুধুমাত্র একজনের গুরুর নির্দেশে অনুসারে অনুশীলন করা উচিত - জিহ্বায় পুংলিঙ্গ স্রোতকে স্ত্রীলিঙ্গ নেতিবাচক স্রোতের সাথে একত্রিত করা। সমাধি ধ্যানে, এই স্রোতের সংমিশ্রণ ঐশ্বরিক আনন্দের রোমাঞ্চ তৈরি করে এবং মুখের মধ্যে অমৃতের ক্ষরণও করে।
ওই অবস্থায় সাধক ধীরে ধীরে অন্তরমুখে গভীর থেকে গভীরতর অবস্থায় প্রবেশ করে। তাই যোগসাধনায় খেচরীমুদ্রা অত্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়া ।"এই খেচরীমুদ্রার অনুধাবন গভীর চেতনার গভীর আধ্যাত্মিক আগমনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।"   বেদে বা সনাতন শাস্ত্রে খেচরীমুদ্রাকে "সমস্ত মুদ্রার মধ্যে সেরা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা" হিসাবে বর্ণনা করা আছে।

"খেচরী- মুদ্রা নিরন্তর অভ্যাস করলে প্রতিদিন সুধাপান করতে সমর্থ হয় এবং শরীর সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জরা মৃত্যু রহিত হয়। এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ যে মাতঙ্গ তাহার পক্ষে কেশরীস্বরূপ। "

খেচর অর্থে আকাশ। আকাশে গমন করলে অর্থাৎ আকাশে অবস্থান করলে নিরালম্বে স্থিতি হয়। তখন নিরালম্বে অবস্থান করায় স্থুল ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত হয়।

কিন্তু শাস্ত্র বলছেন-কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্ঠা বিপরীতগা

বো অন্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রাভবতি খেচরী।

-ঘেরেন্ড সংহিতা ২৭ এবং 'কাশীখণ্ড'।

অর্থাৎ মুখের ভেতরে জিহ্বা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাকে বিপরীত গতি করে অর্থাৎ ঊর্ধ্বে গমন করিয়ে কপাল কুহরে রেখে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির করলে তাকেই খেচরী মুদ্রা বলে। যোগিরাজ বলছেন এই প্রকারে খেচরীমুদ্রা করলে ইন্দ্রিয়দমন হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের কর্ম থেমে যায়, আর স্থুল বস্তুর দিকে না গিয়ে, এটা চাই ওটা চাইরূপ গতি রহিত হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়রহিত হওয়ায় মহাশূন্যে স্থিতি হয়। এই অবস্থাকেই খেচরসিদ্ধি বলে।

ইন্দ্রিয়গণ কতক্ষণ কর্মরত থাকে? যতক্ষণ শ্বাসের গতি বহিমুখী। প্রাণ চঞ্চল বলেই শ্বাসের গতি বহির্মুখী। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকবে। যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা-ভাবনা, আসক্তি, প্রেম, ভালবাসা; অহংভাব, পরশ্রীকাতরতা, দেহবোধ ইত্যাদি সবই থাকবে। কিন্তু এই প্রকারে জিহ্বাকে তালুকুহরে রাখতে পারলে শ্বাসের গতি বহুলাংশে কমে যায়।

তারপর যতটুকু গতি থাকে প্রাণকর্মের দ্বারা তাও রহিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ কর্মহীন হওয়ায় যোগীর মহাশূন্যে স্থিতিলাভ হয়। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে জিভের বিচ্যুতি ঘটে, প্রাণ চঞ্চল হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসও চালু থাকবে জীবও জীবিত থাকবে এবং যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালু থাকবে ততক্ষণ উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলিও কর্মক্ষম থাকবে। আবার জিহ্বা তালুকুহরে রেখে যতই প্রাণকর্ম করবে ততই প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে। এইভাবে যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে ততই ইন্দ্রিয়গুলি কর্মহীন হবে। শেষে যখন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হবে তখন ইন্দ্রিয়গণও সম্পূর্ণ, কর্মরহিত হবে। তখন ইন্দ্রিয়গণ থাকবে বটে কিন্তু তাদের কর্মরহিত হওয়ায় নিষ্কর্ম হবে। একেই বলা হয় ইন্দ্রিয়দের দমন অবস্থা। যোগে এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়দের দমন করে অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থায় রেখে নিজের অধীনে রাখেন এবং সব কর্ম করেন। তিনি কখনই ইন্দ্রিয়দের অধীনে থাকেন না।
যোগী প্রয়োজন বোধে পুনরায় ইন্দ্রিয়দের কর্মক্ষম ও কর্মহীন উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তাই যোগী ইন্দ্রিয়ভয়ে কোনো কিছু থেকে পলায়ন করেন না; কারণ ইন্দ্রিয় তাঁর অধীনে থাকে। প্রয়োজন বোধে ইন্দ্রিয়দের ব্যবহার করেন আবার করেন না। ইন্দ্রিয়দের ওপর যোগীর এমনই দক্ষতা জন্মায়। কারণ স্থির প্রাণে কোনো তরঙ্গ, বৃত্তি বা দেহবোধ থাকে না। চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চভৌতিক এই দেহ তখনই প্রকৃত শুদ্ধ হয়। একেই ভূতশুদ্ধি বলে। তাই মৃতের কোনো জাত থাকে কে না অর্থাৎ মৃতদেহে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয় কর্ম থাকে না। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সবই মনোধর্ম। এ সবই নির্ভর করে দেহে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্বের ওপর। প্রাণহীন দেহে প্রেম ভালবাসা কিছুই নেই। এই প্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় দমন হয়ে আসক্তিশূন্য অবস্থা আসবে, তখন বিষয়, কামিনী, কাঞ্চন এবং সংসার সবই থাকবে অথচ কিছুই বাধাস্বরূপ হবে না। শাস্ত্র আরও বলেছেন-

ভ্রূবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।

উপশ্বাসে বজ্রে নানোপদ্রব বিপ্তত্রি।

সম্বিকোস্থিতে গর্তে রসনাং বিপরীতগাম্।

সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।

মুদ্রৈযা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ।

সিদ্ধীনাং জননী হোষা মম প্রাণাধিকাধিকে।

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ।

তেন বিগ্রহসিদ্ধিং শ্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গ কেশরী ॥ শিবসংহিতা ৫১-৫৪
যোগী উপদ্রবহীন জায়গায় বজ্রাসনে বসে ভ্রূবোরন্তর্গতে (কূটস্থে) দৃঢ়রূপে দৃষ্টি স্থাপন করে রসনা (জিহ্বা) বিপরীতগামী করে আলজিহ্বার উপরস্থিত গর্তে পরি- চালন করে সযত্নে কূটস্থ রূপী অমৃতকূপে সংযোজিত করবে। এই খেচরীমুদ্রা সিদ্ধিলাভের পক্ষে জননীস্বরূপা। ভক্তগণের অনুরোধে প্রকাশ করলাম। শিব আরও বলেছেন-হে প্রাণবল্লতে; এই খেচবীমুদ্রা মহতী সিদ্ধির কারণ। খেচরী- মুদ্রা নিরন্তর অভ্যাস করলে প্রতিদিন সুধাপান করতে সমর্থ হয় এবং শরীর সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জরা

মৃত্যু রহিত হয়। এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ যে মাতঙ্গ তাহার পক্ষে কেশরীস্বরূপ। এই খেচরীমুদ্রার ফল বলতে গিয়ে শিবসংহিতা আরও বলছেন-

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। খেচরী যন্য শুদ্ধা তুস গুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ। - শিবসংহিতা-৫৫

অর্থাৎ যোগী পবিত্র অথবা অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন খেচরীমদোঅপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা।

খেচরী যন্য শুয়া তুস শুল্কো নাত্র সংশয়ঃ। - শিবসংহিতা-৫৫

অর্থাৎ যোগী পবিত্র অথবা অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, খেচরীমুদ্রা সাধন করলে সর্ব-অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকবেন এতে কোন সংশয় নেই। পবিত্র-অপবিত্র মনের ধর্ম। মন চঞ্চল বলেই পবিত্র-অপবিত্র বোধ হয়। কিন্তু খেচরী অবস্থায় থেকে অধিক এবং উত্তমপ্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যখন প্রাণ স্থির হয়ে যায় তখন স্বতঃই শূন্যে স্থিতি হয়। এই প্রকারে শূন্যে মনের স্থিতি হলে মন নিরুদ্ধ হয় ও মনশূন্য অবস্থা হয়। এই মনশূন্য অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য না থাকায় আর মনের কর্ম থাকে না, মনের দৌড় ঝাঁপ চলে যায়। তাই শাস্ত্র বলছেন-

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।

লেম্বিকোষে গর্বেষু রুত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্। - শিবসংহিতা। ১৫৩

অর্থাৎ যে যোগী জিহ্বা বিপরীতগামী করে আজিহ্বা উর্ধ্ব স্থিতি রন্ধ্রে প্রবেশ করেন এবং সেই অবস্থায় জিহ্বা স্থির রেখে কূটস্থে ধ্যান করতে থাকেন তিনি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত ভয় হতে পরিত্রাণ পান। যোগিরাজ এই খেচরীমুদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে বলছেন- "জিহ্বা উঠনেসে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।” এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলছেন-

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাম্।

নানাপাপরতো ধীমান স যাতি পরমাং গতিম্। -শিবসংহিতা। ৫৮

অর্থাৎ যে সাধক গুরুপদেশে এই খেচরীমুদ্রা জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি যদিও মহাপাপে পাপী হন, তথাপি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করতে পারেন। অতএব গুরুর কর্তব্য শিষ্যকে এই বিদ্যা অবশ্যই দান করা এবং শিষ্যেরও কর্তব্য গুরুর নিকট হতে এই বিদ্যা লাভ করা। অধ্যাত্মমার্গে প্রবেশ করিতে হলে খেচরীমুদ্রা সাধন অবশ্য কর্তব্য। এই খেচরীমুদ্রা সাধনকে বলা হয় জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ বা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ যা ক্রিয়াযোগের প্রথম ক্রিয়াতেই বলা হয়েছে। অতএব গুরুগণ যদি সাধককে এই বিদ্যার পথ না দেখান এবং সাধকও যদি গুরুর নিকট হতে কেমন করে খেচরীমুদ্রা সাধন করতে হয় তা যদি জ্ঞাত না হন তবে তাতে না হয় গুরুর উপকার, না হয় শিষ্যের উপকার। কারণ এই বিদ্যা ব্যতিরেকে শিষ্য কখনই আত্মরাজ্যে সঠিকভাবে প্রবেশলাভ করতে পারে না। তাই এই বিদ্যালাভ সকল সাধকের অবশ্য কর্তব্য। খেচরীমুদ্রার মাধ্যমে অমৃতকূপ স্পর্শ করতে হলে জিহ্বা সুদীর্ঘহওয়া আবশ্যক। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধক স্বীয় জিহ্বার নিম্নস্থিত শিরা কেটে ফেলেন। পরে ঘি বা মাখন দিয়ে জিহ্বা দোহন করেন এবং মাঝে মাঝে চিমটা বা সাঁড়াশি দ্বারা টেনে জিহ্বাকে লম্বা করার চেষ্টা করেন।

যোগিরাজের মতে এই প্রকারে জিহ্বাকে লম্বা করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। কারণ কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কেটে ফেললে বা বলপ্রয়োগ করলে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়। তাই তিনি এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে যাতে সকল সাধক সহজেই খেচরী- মুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় দেখিয়েছেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়ে সহজেই সকল সাধক যাতে খেচরীমুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় যোগিরাজ ব্যতীত আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানা যায় না। এই খেচরীমুদ্রার মহান্ উপকারিতা সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে হঠপ্রদীপিকা এবং ঘেরেণ্ড সংহিতায় বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। এই সকল যোগশাস্ত্রে বলা আছে খেচরীমুদ্রার প্রভাব এত অধিক যে, যদি যুবতী নারীও বিন্দুমাত্র রেতঃপাত হয় না। করানোই গো মাংস ভক্ষণ। আলিঙ্গন করে, তথাপি খেচরীমুদ্রাসিদ্ধ সাধকের গো শব্দে জিহ্বা; তালুকুহরে জিহ্বাকে প্রবেশ এই প্রকারে যিনি গো মাংস ভক্ষণ করেন অর্থাৎ জিহ্বাকে নিশ্চল অবস্থায় যিনি তালুকুহরে রেখে কূটস্থে ধ্যানে রত থাকেন সেই সাধকই অমৃত পান করেন। কারণ সহস্রার হতে ক্ষরিত যে অমৃত সুধা তা তিনিই পান করতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলছেন "গলমে মিঠা রস উপরসে নিচে গিরতা নাকসে লহুগি গলকে ভিতর সে থোকেকি সাত-ইসকা নাম অমৃত-ইসকো পিনেসে অমর হোতা হয়।"-জিহ্বা ওপরে উঠিয়ে, তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে, ওই অবস্থায় জিহ্বাকে নিশ্চলভাবে রেখে প্রাণকর্ম করতে থাকলে গলমধ্যে যে মিষ্টরস অনুভব হয় অর্থাৎ সহস্রার থেকে যে অমৃতধারা নীচে নেমে আসে, যা গলা ও নাকের মধ্যদেশে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকেই অমৃত বলে। এই অমৃত সকলেরই ক্ষরিত হয় এবং এই অমৃত দ্বারাই সকলের দেহে পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু এই অমৃতের হদিস সাধারণ মানুষ জানে না। জিহ্বা তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করে কূটম্বরে কাছাকাছি অবস্থান করে যে সাধকের তিনিই এই অমৃতপানে সক্ষম হন। এই অমৃত পান করলে অমর হয়। অমর অর্থে চিরকাল জীবিত থাকা নয়। অমর অর্থে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে চলে যাওয়া, যে অবস্থায় গেলে আর জন্ম হয় না অতএব জন্ম না হলে মৃত্যুও হয় না। যোগী তখন সমস্ত প্রকার চঞ্চলতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করায় 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে' এই অবস্থায় অবস্থান করতে সক্ষম হন। এরই নাম অমরত্ব প্রাপ্তি। দেবতাগণ সমুদ্র-মন্থনে এই অমৃতই পার্শ করেছিলেন। দেবতাগণ অর্থে যে যোগী মহাশূন্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তিনিই দেবতা। সমুদ্রমন্থন অর্থে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের একদিকে সংসার বাসনারূপ গরল, যা যোগীকে আত্মানন্দে অবস্থান করতে দেয় না। প্রাণকর্মরূপ মন্থন ক্রিয়ার মাধ্যমে চঞ্চলতারূপ সংসার প্রবাহের এই গতিকে অতিক্রম করে স্থিরব্রহ্মে মহাশূন্যে অবস্থান করে সহস্রার হতে ক্ষরিত অমৃত পান। ক্রিয়াবান- গণই দেওয়া কারণ ক্রিয়াবানই খেচরীসাধনের মাধ্যমে উত্তমক্রিয়া করে এই অমৃত
পান করে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন- "ভগবত য়ানে ভগকে মাফিক অর্থাৎ যব জিভ নাককে ভিতর তালুমুলমে যায়"-ভগবৎ যোগীর একটা অবস্থা মাত্র। ভগ শব্দের অর্থ যোনি। জিহ্বা যে তালুগর্তে প্রবেশ করে সেই তালুগর্তের আকৃতি যোনিসদৃশ। তাই যোগিরাজ বলছেন জিভ যখন নাসিকার ঊর্ধ্বে তালুমূলে ভগসম গর্তে প্রবেশ করিয়ে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারলে যে. মহানন্দরূপী অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাই ভগবৎ, যা ক্রিয়াবানেরা একটু চেষ্টা করলেই লাভ করতে পারেন। জিভ ওপরে উঠলেই কি এই অবস্থালাভ করা যায়? তা কখনই নয়। জিভকে আরো অধিক ওপরে ওঠাতে হবে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলছেন- "জিভ ডহিনে নাককে ছেদ মে ঘুষা ফির বাএ ছেদকে ভিতর এক অঙ্গুল-আব খিচনেসেভি 'শি' এয়সা শব্দ আতা হয় আউর ফেকনেসে ভি।" -জিভ ওপরে উঠে ভেতরে ডানদিকের নাকের গর্তে প্রবেশ করল, পুনরায় বামদিকের নাকের গর্তে এক আঙুল প্রবেশ করল। এই অবস্থায় প্রাণায়াম টানবার সময় ও ফেলবার সময় উভয় সময়েই 'শি' শব্দ নির্গত হতে লাগল। উত্তম প্রাণায়ামে এই প্রকার 'শি' 'শি' শব্দ নির্গত হয়। কিন্তু জিভকে আরো ওপরে তুলতে হবে, ভগরূপী গর্তে নিশ্চলরূপে অবস্থান করাতে হবে। সেকথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলছেন- "জিভ দোনো নাককে ছেদকে উপর চলা আউর যো শূন্য বাহর সোই ভিতর

দেখলাই দেতা হয়।"-জিভ আরো ওপরে উঠে উভয় নাসাপুট অতিক্রম করে ভগরূপী গর্ভে প্রবেশ করল। এই অবস্থায় উত্তম প্রাণ- কর্ম করতে করতে স্বচ্ছ মহাশূন্য উদয় হল। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। তখন এই মহাশূন্য বাইরে এবং ভিতরে সর্বত্রই একইভাবে দেখা গেল। অতএব যদি কোনো সাধক মনে করে যে জিভ উঠলেই সবকিছু হয়ে গেল তা ঠিক নয়। সেই সাধককে চেষ্টা করতে হবে জিভ যাতে আরো অধিক ওপরে ওঠে এবং ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করে। যতক্ষণ এই ভগরূপী গর্তে জিভের অবস্থান না হয় ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যাঁদের জিভ আলজিভ অতিক্রম করে অন্তত কিছুটা চলে গেছে তাদের পক্ষে এই অবস্থালাভ সুগম হয়। কিন্তু যাদের জিভ ওঠেনি তারা যদি গুরুপ্রদত্ত সহজ কৌশল অবলম্বন ক'রে আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালায় এবং যদি প্রকৃতি বিরূদ্ধ চেষ্টা না করে তবে তারাও যে অচিরে এই অবস্থা লাভ করতে পারবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এরজন্য চাই আন্তরিক চেষ্টা ও পুরুষকারের প্রয়োগ। যিনি এই প্রকারে খেচরীসিদ্ধ অবস্থালাভ করতে সক্ষম হন তিনিই প্রকৃতপক্ষে কামকে জয় করতে পারেন। কামই হোলো সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বলশালী। সাধারণ উপায়ে অন্ত্যান্ত ইন্দ্রিয়দের যদিও বা জয় করা যায়, কামকে জয় করা ততো সুলভ নয়। আবার এই কাম কে জয় করতে না পারলে আত্মরাজ্যে স্বায়ী স্থিতিলাভ করা যায় না। তাই সাধককে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হলে কামকে যে অবশ্যই জয় করা প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন-"জিসনে কামকো জিতা উসনে সব কুছ কিয়া।"-যিনি সবচেয়ে বলশালী ইন্দ্রিয় কামকে জয় করতে পেরেছেন, তিনি অনায়াসে আর সকল ইন্দ্রিয়দের জয় করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জিভকে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করিয়ে উত্তম প্রাণকর্ম করলে শ্বাসের গতি আপনা হতেই স্থির হবে এবং কামসহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও কামনা বাসনা সবই আপনা হতে জয় হবে। এই অবস্থা লাভের পূর্বে যদি কেউ বলেন যে তিনি কামকে জয় করেছেন তবে তা বাতুলতা মাত্র। তাই যোগিরাজ আরো বলছেন-"গলেমে মিঠা মালুম হুয়া আউর ভিতর ভিতর চলা আউর বড়া নেসা মালুম হুয়া এয়সা হমেসা চাহিয়ে"-জিভ আরো ওপরে উঠে তালুকুহরে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করায় সহস্রার থেকে নির্গত অমৃতধারার মিষ্টস্বাদ পেলাম। এই অবস্থায় শ্বাসের গতি ভেতরে ভেতরে চলায় যে গাঢ় নেশার উদয় হল, এই প্রকার নেশা সবসময় প্রয়োজন। যোগী যখন খেচরী সিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন তখন এই প্রকার নেশার উদয় আপনা হতেই হয় এবং সেই নেশায় যোগী বুঁদ হয়ে থাকায় কাম বিবর্জিত, অবস্থা লাভ করেন। তাই যোগিরাজ আদেশ দিয়েছেন যাঁর এই প্রকার খেচরী সিদ্ধ অবস্থা লাভ হয়েছে, যিনি ওঁকার ক্রিয়ায় রত, তিনি গুরু আজ্ঞা সাপেক্ষে ক্রিয়াদান করতে পারেন।